The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 339-349, ISSN 2306-3920

বরেন্দ্রীর গৌরব : পালযুগ

মোছা. সাহিনা আক্তার*

[**সার-সংক্ষেপ:** প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র জনপদ গুরুত্বপূর্ণ। পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের একটি বিশেষ অংশ বরেন্দ্র জনপদ হিসেবে পরিচিত। বাংলায় পাল শাসন ও পাল শাসকগণের সাথে এই জনপদের আছে অবিচ্ছেদ এক সম্পর্ক। কারণ বরেন্দ্র ছিল পালদের জন্মভূমি। বরেন্দ্র জনপদকে কেন্দ্র করেই পাল রাজাগণ শাসনের সুত্রপাত করেন এবং প্রায় দীর্ঘ চারশত বছর বাংলা শাসন করেন। তাঁদের এই দীর্ঘ শাসনকালে যা কিছু গৌরব ও কৃতিত্বের অর্জন রয়েছে তার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এই বরেন্দ্র অঞ্চল। পাল শাসনগণের সুবিন্যস্ত ও প্রজাবৎসল শাসননীতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহঅবস্থান, সাহিত্য-শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় উৎকর্ষতা অর্জন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার এই জনপদের জনজীবনকে দান করেছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায় এই কৃতিত্ব একদিকে যেমন শাসকগোষ্ঠীর একই সাথে এ অঞ্চলের তথা সাধারণ মানুষের।]

ভূমিকা

প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলা একক কোন নামে পরিচিত ছিল না। বাংলা ভূখণ্ড বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। এই বিভক্ত অংশগুলো পরিচিত ছিল জনপদ নামে। প্রাচীন এই জনপদগুলোর মধ্যে উত্তর বাংলার গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ হলো বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। বরেন্দ্র জনপদটি ছিল মূলত পুণ্ড্রবর্ধনের অংশ বিশেষ। প্রাচীন জনপদ হিসেবে বরেন্দ্র জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় সন্ধ্যাকরনন্দীর *রামচরিত* কাব্যে। সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্র জনপদকে পালরাজদের 'জনকভূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.) 1939:116)। বরেন্দ্র জনপদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, এর দক্ষিণে ছিল গঙ্গা এবং পূর্বে করতোয়া এবং পুণ্ড্রবর্ধনপুর ছিল এর প্রধান নগর (Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.) 1939:85)। সেন আমলের তর্পণদীঘি (Majumder, 1929:104) ও মাধাইনগর (Majumder, 1929:115) তাম্রশাসনে বরেন্দ্রকে পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত জনপদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি ১৯৪৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাগপূর্ব বাংলা প্রদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা বরেন্দ্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল। অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি বুকে ধারণ করে উত্তর বাংলার এই প্রাচীন জনপদ আজও দাঁড়িয়ে আছে। পাল রাজাগণ বরেন্দ্র জনপদকে কেন্দ্র করে প্রায় চারশত বছর বাংলা শাসন করে। পাল রাজাদের এই দীর্ঘ শাসনকাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইতিহাসে এক রাজবংশের এতো দীর্ঘশাসন বিরল। নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নিজেদের বিপর্যয়কে ঠেকিয়ে শক্তি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে পাল রাজারা তাঁদের শাসনকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দীর্ঘ শাসনকালে সাম্রাজ্যের

* **ড. মোছা. সাহিনা আক্তার :** সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্প্রসারণ, রাজ্য শাসনে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, জনকল্যাণমুখী শাসননীতি, সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় উৎকর্ষতা সাধন ছিল পাল রাজাদের কৃতিত্ব। আর তাঁদের শাসন কৃতিত্বের এক বড় অংশ জুড়ে ছিল এই বরেন্দ্র অঞ্চল। আলোচ্য প্রবন্ধে পাল শাসনকালে বরেন্দ্র অঞ্চলের গৌরব অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে অরাজক এক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে গোপাল কর্তৃক পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বাদশ শতকের শেষে গোবিন্দ পাল ও পলপালের রাজত্বকালে এই বংশের শাসনের অবসান ঘটে। পাল রাজাদের চারশত বছরের শাসনামলে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা বরেন্দ্র অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পাল রাজাদের তাম্রশাসনে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাল সম্রাটগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পরম, প্রধান ও শেষ আশ্রয়স্থল। পাল রাজাগণ তাঁদের দীর্ঘ শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনকে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ও বিহার অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিহারগুলো ছিল বৌদ্ধধর্ম ও তৎকালীন বাঙালির শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির সুবৃহৎ কেন্দ্র।

বৌদ্ধ বিহারগুলোতে যে শুধুমাত্র ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় গ্রন্থ রচনায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন তা নয়। তাঁরা যোগ, দর্শন, হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা ও শব্দবিদ্যা রচনাসহ কবিতাও সংকলিত করেছেন। সেই সময় বৌদ্ধ আচার্যদের প্রভাব প্রচেষ্টায় উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে সিংহল, সুমাত্রা মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পালযুগের বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে অন্যতম বরেন্দ্রীতে ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহার। সোমপুর বিহার ছিল পাল রাজা ধর্মপালের স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম নিদর্শন। ভারত উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বিহার ছিল এটি। প্রায় বর্গাকারের বিহারটি উত্তর-দক্ষিণে ২৭৪.১৫ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ২৭৩.৭০ মিটার। এ বিহারের মোট ১৭৭টি কক্ষ রয়েছে। বিহারের ক্রুশাকার কেন্দ্রীয় মন্দিরটি ক্রমহ্রাসমান উর্ধ্বগামী তিনটি ধাপে নির্মিত। নীহাররঞ্জন রায় এ মন্দিরকে সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (রায়, ১৩৫৬:৬৮২) তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এস. হক ও এম.এম. হক দেখিয়েছেন সোমপুর মহাবিহারকে সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজ্জ্বল নিদর্শন বলা হলেও এই বিহার মন্দিরে, সর্বতোভদ্র মন্দির স্থাপত্যের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল না। তাঁরা এই বিহার মন্দিরকে ব্রজযানী মন্দির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (Haque, Seema and Haque, M.M, 2019:94)। এই বিহারের সর্বোচ্চ কাঠামোর আকার-আকৃতি সম্পর্কে জানা যায় না। তবে ধাপের উর্ধ্বমুখী শূন্যগর্ভ বর্গাকার কক্ষকে কেন্দ্র করে বিশাল মন্দিরটি বিভিন্ন পর্যায়ে গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কক্ষটি চতুর্দিকের দেয়ালের গায়ে আড়াআড়ি ভাবে নতুন দেয়ালযুক্ত করে দ্বিতীয় ধাপে চারদিকে চারটি কক্ষ ও মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। মন্দির পরিকল্পনার সমান্তরালে চারদিকে দেয়াল-বেষ্ঠিত প্রদক্ষিণ-পথ নির্মাণ করা হয়েছিল, যার ফলে মন্দিরটি ক্রুশাকার ধারণ করে এবং ক্রুশের প্রতি দুইবাহুর মধ্যবর্তী স্থানে কোণের সৃষ্টি হয়। ভিত্তি পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে মন্দিরের চর্তুদিকে বেষ্টনী দেয়াল ছিল। বিহারের উত্তর বাহুর মাঝামাঝি প্রধান প্রবেশ তোরণ বিদ্যমান। এ বাহুর পূর্ব কোণে অপর একটি আয়তাকার প্রবেশ পথ ছিল। সম্ভবত পূর্ব বাহুর মধ্যস্থল বরাবর একটি ক্ষুদ্রাকার প্রবেশ পথ ছিল (রহমান (সম্পা.), ২০০৭:২৮০)। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ইন্দোনেশিয়ার জাভায় নির্মিত বিশ্ব বিখ্যাত বরবদোর বৌদ্ধ মন্দিরের সর্বোচ্চ অংশে নির্মিত গোলাকার টাওয়ারের মতই পাহাড়পুরের শূন্যগর্ভ কক্ষটি সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। (চৌধুরী, সাইফুদ্দীন, ফজল, মুহাম্মদ আবুল, রহমান, শাহ আনিসুর ও ইসলাম, তাসিকুল (সম্পা.), ১৯৯৮:৩৬৮) আচার্য ও মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, আচার্য কালপাদ, মহাআচার্য শ্রী অতীশ দীপঙ্কর, মহাযানযারী স্থবির বৃদ্ধ বীরেন্দ্র আচার্য, জ্যোতি করুণা শ্রী মিত্র প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ কোন না

কোন সময় এই মহাবিহারে বাস ও জ্ঞানচর্চা করেছেন (হোসেন, ২০১২:১৭৭)। পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শন প্রাচীন যুগে বরেন্দ্র অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে চৈনিক, তিব্বতী, সমসাময়িক সাহিত্য ও অভিলেখ মালার প্রাপ্ত তথ্যেরই সমর্থন করে।

পাল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশেষ করে ধর্মপাল কর্তৃক সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা হবার পর পাহাড়পুর তথা সমগ্র বাংলায় মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এই বিহার। সোমপুর বিহারে চীন, তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষার্থী বিদ্যার্জন ও ধর্ম শিক্ষার জন্য আসে। সুদীর্ঘকাল ধরে সোমপুর বিহার তিব্বতীয় মহাযানী বৌদ্ধদের জন্য জ্ঞানার্জন ও ধর্মশিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থল ও জলপথে এসব দেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষার্থীরা বাংলায় আসতো। রাজনৈতিক সুসম্পর্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাংলার মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম জাভা সহ ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে, দ্বীপপুঞ্জে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে প্রভূত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। বাংলার পাল আমলের উদ্ভাবিত বিহার স্থাপত্য রীতি ঐসব অঞ্চলের বিহার স্থাপত্যকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

সোমপুর বিহার ছাড়াও বরেন্দ্র জনপদে পালযুগের আরো কিছু বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগদ্দল মহাবিহার, ভাসুবিহার, সীতাকোট বিহার, হলুদ বিহার, বিহারৈল বিহার। জগদ্দল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাল রাজা রামপাল। রামপালের রাজধানী নগর রামাবতীর সন্নিকটে অবস্থিত জগদ্দল মহাবিহারের অধ্যক্ষ বিদ্যাকর *সুভাষিতরত্নকোষ* নামক কোষ কাব্যটি এই বিহারে বসেই সংকলন করেছিলেন (হোসেন, ২০১২:১৭৭)। এছাড়া এ বিহারে অবস্থান করেন বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোঙ্গাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রমুখ আচার্য। দিনাজপুর জেলার সীতাকোট বিহারটি পঞ্চম শতকের নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রায় বর্গাকৃতির মাঝারি আকৃতির এই বিহার। সপ্তম শতকে বাংলায় এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং। তিনি পুণ্ড্রবর্ধনে বিশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ভাসুবিহার হিউয়েন সাং উল্লেখিত পো-সি-পো বিহার (দাশগুপ্ত, ২০১৬:১৪১) এক ও অভিন্ন বলে প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম মত প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিককালে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে দুইটি মাঝারি আকারের বিহার ও একটি বৌদ্ধ মন্দির উন্মোচিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক ও সীলমোহর পাল যুগের ভাস্কর্য শৈলী ও শিল্পকলার অনবদ্য স্বাক্ষর বলে অনুমিত হয়। পাহাড়পুরের অনতিদূরে অবস্থিত হলুদবিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার, রাজশাহীর বিহারৈল বিহার, পুণ্ড্রবর্ধনের ভাসুবিহার বরেন্দ্রীর বৌদ্ধ কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

দশম শতক হতে পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল ছিল বরেন্দ্র। বরেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই এই সময়ের পালশাসকদের শাসন পরিচালিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বরেন্দ্রীর গৌরবের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে এ জনপদের নগরসমূহ। বরেন্দ্র জনপদের নগর জীবন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে। রামাবতী, (Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.), 1939:101) শোণিতপুর, (Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.), 1939:84) পুণ্ড্রবর্ধন (Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.), 1939:153) ও স্কন্দনগর (Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.), 1939:48) এই চারটি নগরের উল্লেখ আছে *রামচরিত* কাব্যে।

পুণ্ড্রবর্ধন নগর ছিল উত্তর বাংলার সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান নগর। মৌর্য শাসনকালে এই নগর ছিল জনৈক মহামাত্রের শাসনাধিষ্ঠান। গুপ্ত শাসনামলে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ভূক্তিকেন্দ্র ছিল এই পুণ্ড্রনগর। গুপ্ত থেকে শুরু করে মুসলিম আমল পর্যন্ত এই নগর ছিল ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর *রামচরিত* কাব্যে এই নগর সম্পর্কে বলেছেন:

বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃকুলস্থানম্।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পূণ্যভূবৃর্হদ্ঘটুঃ ॥

অর্থাৎ: পৃথিবীর শিরোভূত বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণি সদৃশ, শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনপুরের সংলগ্ন 'বৃহদ্ঘটু-নামক' পূণ্যক্ষেত্রই (কবির) কুলস্থান ছিল (বসাক (সম্পা.), ১৯৫৩:১৪২)।

বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরের মহাস্থানের সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষই পুণ্ড্রনগর। নগরের যে ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে উন্মোচিত হয়েছে তাতে দেখা যায় নগর অভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, অভিজাতদের বাসভবন, প্রশাসনিক দফতরের ভবন, মন্দির, সভাগৃহ, সৈন্যসামন্তদের আবাসস্থল, পরিখা, বিহার ইত্যাদি। *রামচরিতে* পুণ্ড্রবর্ধনের সারিসারি বিপণি বিতানের বর্ণনা আছে। এছাড়া অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, মাটি, পাথর, ধাতব মূর্তি, মুদ্রা লিপি ইত্যাদি এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সামরিক গুরুত্বসহ সর্বভারতীয় এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবেও পুণ্ড্রনগর ছিল ইতিহাস খ্যাত।

বরেন্দ্রীর রামাবতী নগরী পাল কীর্তির অনন্য স্বাক্ষর। পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী উদ্ধার করার পর রামপাল নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজধানীর নামকরণ করেন *রামাবতী* (মিশ্র, ২০১০:৫)। এই *রামাবতী* নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন সন্ধ্যাকরনন্দী *রামচরিত* কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৯-৪০ নং মোট ১২টি শ্লোকে। তিনি বর্ণনায় *রামাবতীকে* দেবতা ইন্দ্রের রাজধানী আমরাবতীর প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছেন। সাধু, সজ্জন, জ্ঞানী বিখ্যাত মনিষীগণ মাদলের ব্যঞ্জনায় মুখরিত এ নগরীতে বসবাস করতো (বসাক (সম্পা.), ১৯৫৩:৯৪)। রামাবতী ছিল দেবতা ও ধনীদের নগরী। রামপাল এ নগরীতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রাসাদ ছিল আনন্দের উৎস কারণ এখানে সঞ্চিত ছিল অনেক দামী পাথর হীরা, মণি, মুক্তা প্রবাল, সুন্দর নকশা খচিত স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাব, দামীবস্ত্র চন্দন কর্পূর, মৃগনাভি, জাফরান। *রামচরিত* কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩-৩৯ নং শ্লোকে এমনটাই উল্লেখই পাওয়া যায়। রামাবতী নগরীয় ধনসম্পদের প্রাচুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন:

বজ্রবিদূরজমুক্তামরকতমাণিক্যনীলমণিখচিতৈঃ
সুরধামচারুচঞ্চন্মরীচিমঞ্জরীজালৈ ॥
আভরণৈরুপকরণৈর্বভূরিভিরভিরামহেমণির্ম্মাণৈ
বৃত্তোরুতারতরলৈর্হারৈরপি-হারিভির্ব্বহুভিঃ॥

অর্থ: রামাবতীতে যে প্রাসাদে রামপাল ও হরি মিলিত হয়েছিলেন তা যা যা উপায়নীভূত বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ আনন্দের একমাত্র নিদান ছিল নিম্নরূপ: সেখানে ছিল হীরক বৈদুর্য্য, মুক্তা, মরকতমণি, পদ্মরাগমণি ও নীলমণি-খচিত এবং আকাশে ও দেবভবনে রশ্মিবল্লরীসমূহের অপূর্বভাবে বিস্ফুরণকারী আভরণসমূহ; সেখানে আরও ছিল বহুসংখ্যক সুবর্ণঘটিত মনোজ্ঞ উপকরণ দ্রব্য, আসবাবপত্র; এবং সেখানে আরও ছিল বহু মনোলোভী হারসমূহ যাতে শুদ্ধ মৌক্তিকগুলি ও মধ্যমণিগুলি বৃত্ত বা বর্তুলাকার ও প্রকাণ্ড ছিল (বসাক (সম্পা.), ১৯৫৩:৯৬)।

এ প্রাসাদে থাকতো দেববারবণিতা। দেববারবণিতারা তাদের উপযোগী কাপড় পড়ে আবেগের সাথে নাচ করতো। নাচের তালে তালে বেজে উঠতো তাদের পায়ের মণিরত্ন খচিত নূপুর। নগর অভিজাত জীবনে বারবণিতা যে প্রধান অঙ্গ ছিল সে উল্লেখ আমরা সমসাময়িক লিপি ও সাহিত্যেও পাই। *রামচরিত* কাব্যে রামাবতী নগরীর ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবনের চিত্র কবি সন্ধ্যাকরনন্দী অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রামপালের রাজধানী এই রামাবতীর অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত পাওয়া যায়। রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার নিকটবর্তী কোন স্থানে রামাবতী নগরীর অবস্থান ছিল (বসাক (সম্পা.), ১৯৫৩:৫)। নীহাররঞ্জন রায় রামাবতীর অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, "সেন আমলের গৌড় বা লক্ষণাবতী নগরের অদূরে গঙ্গা-

মহানন্দার মঙ্গলস্থলের সন্নিকটে ছিল রামাবতীর অবস্থিতি" (রায়, ১৩৫৬:৩০২)। তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় ও আব্দুল মমিন চৌধুরী রামাবতীকে *আইন-ই-আকবরীতে* উল্লেখিত সরকার লখনৌতিতে অবস্থিত রামউতির সাথে এক ও অভিন্ন মনে করেছেন। সন্ধ্যাকরনন্দী যে নগরকে আমরাবতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই রামাবতী নগরের ধ্বংসাবশেষও আজ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁর *রামচরিত* কাব্যে রামাবতী ও পুণ্ড্রবর্ধন নগরের সাথে বরেন্দ্রীর আরো দুটো নগরের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লেখিত স্কন্দনগর বরেন্দ্রীর কোনস্থানে অবস্থিত তা আজও জানা যায়নি। তবে শোণিতপুর সুপ্রাচীন কোটিবর্ষ নগরের অপর নাম বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান দিনাজপুর জেলার বানগড়ে প্রাচীন কোটিবর্ষ নগরীর অবস্থিতি চিহ্নিত হয়েছে। সমগ্র বানগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামজুড়ে এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তৃত। পাল বংশের একটি ও কম্বোজরাজবংশের একটি তাম্রশাসনসহ অসংখ্য মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর, স্তম্ভ খণ্ড, ক্ষুদ্র-বৃহৎ মন্দির নিদর্শন সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। পঞ্চম শতক হতে পাল শাসনের শেষ পর্যন্ত কোটিবর্ষ নগর পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির সর্বপ্রধান বিষয় কোটিবর্ষ বিষয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল (রায়, ১৩৫৬:৩০১)। বরেন্দ্রীয় এই নগরগুলো ছিল পাল শাসনামলের গৌরবের বড় অংশ।

সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বরেন্দ্র অঞ্চলের নগরগুলো বিকাশ লাভ করেছিল। নগরগুলোর অধিবাসী হিসেবে শিল্পী, বণিক ব্যবসায়ী, সমাজ-সেবক ও সমাজ-শ্রমিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায় রাষ্ট্রপ্রধান, সমৃদ্ধ বিত্তবান ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠী, শিল্পী ও বণিকগণই যথার্থত নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতেন। নাগরিকগণই ছিলেন সামাজিক ধনের প্রধান বণ্টনকর্তা এবং নগরগুলোই ছিল প্রাচীন বাংলার সামাজিক ধন, ঐশ্বর্য ও বিলাস ও আড়ম্বরের প্রধান কেন্দ্র।

পাল শাসনামলে বরেন্দ্রীর জনপদের কীর্তির বড় অংশজুড়ে আছে পাল ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে এ শিল্প মোটেও একান্তভাবে ধর্মাশ্রয়ী ছিল না। উপমহাদেশীয় শিল্পকলার ইতিহাসে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য এক অনন্য অধ্যায়। গুপ্ত পূর্বযুগের দুইটি পাথরের মূর্তি এখন পর্যন্ত বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করছে। মূর্তি দুটি হলো মহাস্থানগড়ের কাছে বাঘোপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত লাল বেলে পাথরের দণ্ডায়মান কার্তিকের মূর্তি (Saraswati, 1962:11) ও জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার পাথরঘাটা গ্রামে প্রাপ্ত মোটাদানার কঠিন বেলে পাথরের পুরুষ মূর্তি (রহমান (সম্পা.), ২০০৭:৩৮১)। বরেন্দ্র অঞ্চলের শিল্পীরাই স্থানীয় পর্যায়ে এই মূর্তিগুলো তৈরি করেছিলেন। এ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গুপ্তপর্বের দুটি ভাস্কর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি হলো রাজশাহীর বিহারৈল গ্রাম থেকে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি (Saraswati, 1962:23) অপরটি বগুড়া জেলার নারহট্ট গ্রাম তেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তি (Haque, 1992:58)। গুপ্তশাসনের শেষদিকে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাথরের পাশাপাশি ব্রোঞ্চ এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল পালযুগে। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় ভাস্কর্য শিল্প নতুন রূপে বিকাশিত হয়। বরেন্দ্র তথা বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিরাট মোড় পরিবর্তন ঘটে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পাল যুগে বিকশিত ভাস্কর্য শিল্পের এ রূপ 'পাল স্কুল অব স্কাল্পচারাল আর্ট' বা পাল ভাস্কর্য রীতি হিসেবে আখ্যায়িত হয় (চৌধুরী, ২০০২:১১৫)। পালযুগের ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান উপাদান ছিল পাথর। তবে পালযুগে বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত ধাতব ভাস্কর্যের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই এ মত প্রকাশ করেন যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রস্তর-ভাস্করেরা ভারতের বিহার প্রদেশের ছোট নাগপুর ও রাজমহল পাহাড় থেকে আনা পথর দিয়ে প্রস্তর ভাস্কর্য নির্মাণ করতেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের উল্লেখ থেকে জানা যায় পাল ভাস্কর্য রীতি প্রবর্তনে বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিবাসী শিল্পী ধীমান ও তার পুত্র বীটপালের বিশেষ অবদান

ছিল (Paul, 1940:117)। ভাস্কর্য, ধাতবশিল্প ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই পিতাপুত্র একটি বিশিষ্ট শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে বরেন্দ্র ভূমির শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি এক রাণক শূলপাণির উল্লেখ পাওয়া যায় (Majumder, 1929:56)। পাল ও সেন শাসনকালের সর্বাধিক ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চলে।

অষ্টম শতকের শেষ ও নবম শতকের প্রথম ছিল পাল শিল্পশৈলীর বিকাশকাল। এ সময় বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দিনাজপুর জেলার খিয়ারমাহমুদপুর এর বিষ্ণু, কাকদ্বীপের বিষ্ণু ও করইচরচরের বিষ্ণু মূর্তি। প্রথমপর্বে পাথরের অপ্রতুলতা ও দীর্ঘকাল মৃৎশিল্পের প্রসারের কারণে প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শনের সংখ্যা কম। পরবর্তীতে দেখা যায় নবম ও দশম শতকে পাল শিল্প শৈলীর অগ্রযাত্রা হয় দ্রুত। এ সময়ে বরেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর ভাস্কর্যের সংখ্যা প্রচুর এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, দশম শতক বাংলা প্রতিমা শিল্পের সুবর্ণ যুগ' (রায়, ১৩৫৬:৬৬২)। একাদশ শতক বরেন্দ্র তথা বাংলা ধ্রুপদী ভাস্কার্যের শেষ সফল শতক। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল ভাস্কর্য শৈলী অপরিবর্তিতই ছিল কিন্তু ক্রমে পাল রাজশক্তি বরেন্দ্র থেকে বিতাড়িত হয়ে মগধ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলে ভাস্কর্য শিল্পে বিরূপ প্রভাব পরে আর এর সাথে যুক্ত হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকদের রক্ষণশীলতা। বরেন্দ্রের সুপ্রাচীন ভাস্কর্য শিল্প পাল আমলে অগ্রগতি লাভ করে সুউচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছিল। ধর্মনির্ভর এ শিল্প ধর্মকর্ম ক্রিয়ার একান্ত সহায়ক ও ধর্মনির্বিশেষে অধ্যাত্মিক কল্পনার উৎস ছিল। এই শিল্প তার ধ্রুপদী মর্যাদা ও শাশ্বত সজীবতা হারিয়ে ফেলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকদের জৈব কামনা-বাসনা তথা ভোগচেতনার আতিশয্যে। সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে তুর্কী সেনারা যখন বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন এ অঞ্চলের ধ্রুপদী এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের অবসান ঘটে (রহমান, ২০০৭:৩৯০)।

প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চলের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল। এ শিল্পকলার প্রধান উপাদান ছিল মাটি। বরেন্দ্র অঞ্চলে মৃৎ শিল্পকলার অসংখ্য নিদর্শন আমরা পাই। লোকায়ত ও গ্রামীণ এ শিল্পকলার অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক বাংলার মৃৎ শিল্পীদের অনন্য সৃষ্টি। বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনার দেয়াল গাত্রালংকারে ব্যবহৃত এ ফলকগুলোতে ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও স্থান পেয়েছে বাংলার সমাজজীবনের নানা বিষয়। পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো পোড়ামাটির ফলক। এছাড়া অন্যান্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভাস্কর্য, সিল ও সিলমোহর, পোড়ামাটির খেলনা, গুটিকা, বাটখারা, ঘণ্টা, অলংকৃত ইট প্রভৃতি। পাল শাসনামলে নির্মিত সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে প্রচুর পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। বিহারের কেন্দ্রীয় ক্রুশাকৃতি মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের অলংকরণে প্রায় ৩০০০ পোড়ামাটির ফলক চিত্র ব্যবহৃত হয়েছিল (ভূঁইয়া, ২০০৩:২১)। মূলত বিহারের মন্দির গাত্র অলংকরণের জন্যই এই পোড়ামাটির ফলকগুলো তৈরি হয়েছে। ফলকগুলো যেহেতু অলংকরণের জন্যই নির্মিত হয়েছিল তাই এগুলোর ধর্মীয় তাৎপর্যের দিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেবদেবীর মুর্তির পাশাপাশি প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এখানে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব, পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা, ইত্যাদি বৌদ্ধ দেবদেবী সহ ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী যেমন শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, সূষ্ঠ দেবতাদের মূর্তিও এই ফলকগুলোতে দেখা যায়।- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবী ও রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী চিত্র ফুটিয়ে তোলার এ প্রচেষ্টা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইঙ্গিত বহন করে। বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি ছিল সমগ্র বাংলায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তবে ফলক চিত্রগুলো থেকে এটা অনুমান করা যায় বরেন্দ্র ভূমিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেই ছিল সমৃদ্ধশালী। সোমপুর বিহার, হলুদ বিহার, ভাসুবিহার সহ বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল আমলের বিহারগুলো থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক ও মৃৎশিল্পের অন্যান্য নিদর্শন গ্রামীণ লোকায়ত শিল্পের পরিচয় বহন করে। এগুলো বাংলার লোকশিল্পীদের কীর্তি

(Majumder (ed.), Forth Repression 2006:528)। এই ফলকগুলোর বেশির ভাগই প্রস্তর ভাস্কর্যেও ন্যায় উন্নত শিল্পীশৈলীর প্রমাণ বহন করে না। পোড়ামাটির ফলকগুলোতে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তি মানসের প্রকৃতি অত্যন্ত সাবলীলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, যা এই ফলকগুলোর বড় কৃতিত্ব। প্রস্তর ভাস্কর্যে উন্নত শিল্পী শৈলীর উপস্থিতি থাকলে তা ছিল রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর দখলে, সাধারণ মানুষ ছিল সেখানে নিষিদ্ধ, উপেক্ষিত। পোড়ামাটির শিল্পকর্ম প্রস্তর ভাস্কর্যের সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছিল। কারণ এ শিল্পের সাথে জড়িত মানুষগুলো কোন ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল না (Haque, 2014:59)। ফলে সাবলীল উপস্থাপন, স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা ও লৌকিক জীবনের বিষয়বস্তুর প্রকাশের অতুলনীয় ক্ষমতা বরেন্দ্রের এই শিল্পসৃষ্টিকে বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে।

পাল শাসনকালের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতে লেখা অলংকরণের উদ্দেশ্য অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত পুঁথি বাংলার চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বৌদ্ধ মহাযান মতাদর্শের গ্রন্থ *পঞ্চরক্ষা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*, *পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* অনুলিপি ছিল পালযুগের এই চিত্রিত পুঁথিগুলো। এই চিত্ররীতির প্রবর্তন হয়েছিল পাল শাসক ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে। (রহমান, ২০০৭:৪৬৯) ২৪টি চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি এ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। প্রায় চারশত চিত্রের মধ্যেই পালযুগের চিত্রকলা প্রকাশ পেয়েছে (চৌধুরী, ২০০২:১১৬)।

বরেন্দ্র অঞ্চলে এই ধরনের চিত্রিত পাণ্ডুলিপির পরিচয় পাওয়া যায় একাদশ-দ্বাদশ শতকে। পাল রাজা রামপালের রাজত্বকালে ৩৯ বর্ষে লিখিত *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* পুথিঁ এবং রাজা হরিবর্মার ১৯ বর্ষে লিখিত *পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা* পুথিঁ বরেন্দ্র অঞ্চলে লিখিত বলে অনুমান করা হয়। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে হরিবর্মার পুথিঁটি সংরক্ষিত আছে। পাল শাসনামলে বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাস্কর্যের মতো চিত্র শিল্পেরও একটা ঐতিহ্য ছিল তার সাক্ষ্য বহন করে এই চিত্রিত পাণ্ডুলিপিগুলো। এ প্রসঙ্গে বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

> কোন কোন কলা ঐতিহাসিক, বরেন্দ্রের পাল-চিত্র শৈলীর মধ্যে অজন্তা-বা ইলোরার ক্ল্যাসিক্যাল চিত্ররীতির প্রভাব আবিষ্কার করতে চান। এ অনুমানের সঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণ, পূর্ব ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় বরেন্দ্রের বিশেষ করে সোমপুর বিহারে যে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ এবং পুরোহিত বসবাস করতেন, সম্ভবত তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই বসবাস করতেন ঐ পাল-চিত্রকরগণ। এজন্য ভিক্ষু, শ্রমণ, পুরোহিত এবং চর্যাকারদের ন্যায় এই শিল্পীরাও বাইরে থেকে এসে থাকতে পারেন। যাদের আদর্শ ছিল বিশেষভাবে অজন্তা ইলোরার ক্ল্যাসিক্যাল রীতি, যে অভিজ্ঞতা এখানের চিত্রকর্মে তারা সংযোজিত করেছেন তবে এই চিত্রগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এগুলিতে বরেন্দ্রে সমসাময়িককালে ভাস্কর্য শিল্পের সে ঘরানা গড়ে উঠেছিল তার একটা প্রভাব পড়েছে (চৌধুরী, সাইফুদ্দীন, ফজল, মুহাম্মদ আবুল, রহমান, শাহ আনিসুর ও ইসলাম, তাসিকুল (সম্পা.), ১৯৯৮:৫৫১)।

এ থেকে বলা যায় পাল চিত্রশৈলীর সাথে সর্বভারতীয় রীতির সমন্বয়ের ফলে বরেন্দ্রের চিত্রকলা একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছিল।

পাল শাসনকালে বরেন্দ্র অঞ্চল সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল। শুধু সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের চর্চা নয় দেশ-ভাষা বাংলার দিকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে সাহিত্য সাধনায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহারগুলো অবদান ছিল অপরিসীম। বরেন্দ্র ভূমির সোমপুর, জগদ্দল বিহার, হলুদবিহার, সীতাকোটবিহার, ভাসুবিহার পাল যুগে সাহিত্য চর্চার ধারাকে প্রবাহমান রেখেছিল। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন *চর্যাপদ*। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাগুলির

রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে (হাই, মুহাম্মদ আব্দুল ও পাশা, আনোয়ার (সম্পা.), ২০১৪:৯)। অর্থাৎ পাল শাসনকালেই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন *চর্যাপদ* রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষাভাষী তথা বরেন্দ্রভূমিতে বসবাসকারী মানুষের জন্য এটি গৌরবের যে বরেন্দ্র এলাকার ভাষাতেই প্রাচীন *চর্যাপদ* রচিত হয়েছিল তাই বরেন্দ্রভূমিকে *চর্যাপদের* সূতিকাগারের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে (চৌধুরী, সাইফুদ্দীন, ফজল, মুহাম্মদ আবুল, রহমান, শাহ আনিসুর ও ইসলাম, তাসিকুল (সম্পা.), ১৯৯৮:৮৩৬)। *চর্যাপদে* মোট ৫০টি পদের ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। চর্যাপদের পদকর্তাগণের মধ্যে কাহ্নপা, শবরীপা, লুইপা, সরহপা বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় (চৌধুরী, সাইফুদ্দীন, ফজল, মুহাম্মদ আবুল, রহমান, শাহ আনিসুর ও ইসলাম, তাসিকুল (সম্পা.), ১৯৯৮:৮৯০)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে *চর্যাপদের* ভাষা হলো আলো আঁধারির ভাষা কিছুটা অনুধাবন করা যায়, কিছুটা যায় না। *চর্যাপদের* সব পদগুলোর মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা। ধর্মের নানা বিষয় বলতে গিয়ে পদকর্তাগণ সমসাময়িক লৌকিক জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সেকালের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম, কাজ ও আনন্দ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, পারিবারিক জীবন, পোশাক পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য ও বাসনপত্র, অপরাধ ও বিচার পদ্ধতি, সঙ্গীত ও সঙ্গীতের উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশুদ্ধ শিল্পসম্মত বর্ণনা আমরা চর্যাপদের পদগুলোতে পাই। রাজা বা অভিজাত শ্রেণীর বিলাসী জীবনের বর্ণনা এখানে স্থান পায় নি, স্থান পেয়েছে ডোম-ডোমণী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক শ্রেণীর কথা। চর্যাপদের ১০নং পদে তেমন উল্লেখই আমরা দেখি:

নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ ॥

অর্থ: নগরের বাইরে, ডোম্বি, তোমার কুঁড়ে ঘর; ব্রাহ্মণ নেড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও (মজুমদার, ২০১৬:১০৮)।

চর্যাপদে প্রাপ্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানারূপ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সুগভীর আধ্যাত্মিক দর্শন বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করেছিলেন। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তাঁরা এসব রচনা করেননি। মূলত সুগভীর জীবনবোধই সিদ্ধাচার্যগণকে এমন রূপক ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করেছিল (মজুমদার, ২০১৬:৪৯)। বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন বিহারে অবস্থান করে এই সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া সাধন পদ্ধতিমূলক পদ রচনা করেন। এছাড়া অতীশ দ্বীপংকর শ্রীজ্ঞান সোমপুর বিহারে অবস্থান করে ভাববিবেকের *মধ্যমকরত্ন-প্রদীপ* গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন (রায়, ১৩৫৬:৫৯৬)। বরেন্দ্র ভূমির অন্যতম বিহার জগদ্দল মহাবিহারে দুজন বিখ্যাত পণ্ডিত দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। তাঁরা দুজন ছিলেন একাধারে টীকাকার, অনুবাদক। এছাড়াও মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি মনীষী আর্চাদের দ্বারা জগদ্দল মহাবিহার ধন্য হয়েছে (রায়, ১৩৫৬:৬০৫)।

পালযুগের অভিলেখমালাগুলোও সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। অভিলেখমালার শ্লোকগুলোতে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ স্পষ্ট। উপমায়-রূপকে, অনুপ্রাসে-অলংকারে, ছায়ায়-ছবিতে সর্বভারতীয় কাব্য ঐতিহ্যের অনুগামী এই অভিলেখমালা। বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত পালযুগের অভিলেখ গুলোতে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অভিলেখগুলো যাঁরা লিখতেন তাঁরাও ছিলেন সভাকবি ও পণ্ডিত। নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের উল্লেখ থেকে জানা যায় তাঁর পিতা কেদারমিশ্র ছিলেন দেবপালের মন্ত্রী। কেদারমিশ্র ছিলেন চতুর্বেদে ব্যুৎপত্তি প্রাপ্ত (শাস্ত্রী, ১৯৯২:৭০)। গুরুবমিশ্র নিজেও বেদ, নীতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন (শাস্ত্রী, ১৯৯২:১৪১)।

পালযুগের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য *রামচরিত*। *রামচরিত* কাব্যটি রচনা করেছেন সন্ধ্যাকরনন্দী। সন্ধ্যাকরনন্দী ছিলেন পাল রাজা রামপালের রাজত্বকালের একজন কবি ও ভাষাবিদ।

কাব্যের প্রশস্তি অংশে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সন্ধ্যাকরনন্দী লিখেছেন, তাঁর জন্মভূমি বরেন্দ্রী মণ্ডলের মুকুটমণি পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর সন্নিকটে অবহিত পূণ্যভূমি বৃহদবটু গ্রামে। তার পিতা ছিলেন প্রজাপতি নন্দী ও পিতামহ পিনাকনন্দী প্রজাপতি নন্দী ছিলেন রামপালের *মহাসান্ধিবিগ্রহিক* বা যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী (বসাক, ১৯৫৩:১৪৩)। *রামচরিত* কাব্যটি একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য। কাব্যের প্রতিটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে একই সাথে রামসীতার কাহিনী ও পাল সম্রাট রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের ঘটনা। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সন্ধ্যাকরনন্দী দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সংঘটিত বরেন্দ্র বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ পরবর্তী ঘটনা, বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রামাবতী নগরীর ঐশ্বর্যের কথা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। বরেন্দ্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন:

অপি পৃথুকচ্ছবলভীকৃশতর কালীকৃতোত্থানাম্।
অপি বিশ্রুতপলাশিবৃতামশোকবন্যাপ্তাম ॥

অর্থ: সেই (বরেন্দ্রী) বিপুল জলপ্রায় দেশযুক্ত ছিল এবং এতে বলভী নাম্নী নদী ও কৃশতারা (ক্ষণীকায়া) কালী নাম্নী নদী উত্থান বা উৎপত্তি লাভ করেছিল এবং এটি বিখ্যাত বৃক্ষসমূহদ্বারা আকীর্ণ ছিল এবং এটি অশোক বৃক্ষসমূহের কানন ধারণ করতো (বসাক, ১৯৫৩:৭৯)।

এই কাব্যের অপর একটি শ্লোকে কবি বরেন্দ্রীর ফল, ফুল ও বৃক্ষাদিশোভিত উদ্যানের বর্ণনা করেছেন এভাবে:

পরমবিরলকন্দাবলীময়মবিরলকলকুণ্ঠকূজম্মুখম্।
পৃথুলকুচশ্রীফলকম্পনসহিতং লোলমঞ্জুলবলীকম্ ॥

অর্থ: সেই (বরেন্দ্রী) সেই উত্তম উপবন ধারণ করেছিল সেখানে ঘনভাবে রোপিত কন্দমুল ছিল, যার প্রবেশদ্বারে অবিরলভাবে কোকিল কূজন করতো, যাতে বিপুল পরিমানে কলুচ ও শ্রীফল বৃক্ষ থাকতো এবং যা পনসবৃক্ষযুক্তও থাকতো এবং যাতে চঞ্চল ও মনোজ্ঞ লবলীলতা বিদ্যমান থাকতো (বসাক, ১৯৫৩:৭৯)।

সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রীর ফুল, ফল উৎপাদিত নানা রকম ফসল ও বৃক্ষের বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রচুর নারিকেল ও গুবাক উৎপন্ন হতো বলে কবি উল্লেখ করেছেন। শস্য ভাণ্ডার ও নানারকম ফলের মত বরেন্দ্রী নানা ফুলে সুশোভিত ছিল। নিম্নের শ্লোকে তেমনটাই বর্ণিত হয়েছে:

পৃথুসুমনঃ পরনাগাপরকেসরমালভারিণীং দধতীম্।
প্রবলমধুপারিজাতলবঙ্গমিতামোদসম্পত্তিম্ ॥

অর্থ: সেই (বরেন্দ্রী) বৃহৎ মালতী, শ্রেষ্ঠ নাগকেসর ও রমণীয় বকুল বৃক্ষসমূহ ও মালভূমি (উন্নত ভূমি) ধারণ করতো এবং তা পল্লববহুল মধু (অশোক) বৃক্ষ, পারিজাত বৃক্ষ ও লবঙ্গলতার সৌরভ সম্পদে ছিল আকীর্ণ (বসাক, ১৯৫৩:২০)।

কবি সন্ধ্যাকরনন্দী *রামচরিত* কাব্যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার সাথে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফুল, ফল, ফসল ও বৃক্ষরাজির যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন তাতে কবির স্বদেশ চেতনা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান (মিশ্র, ২০০৮:৫)। এই কাব্যকে কবি নিজে কলিযুগের রামায়ন বলে আখ্যায়িত করেছেন (বসাক, ১৯৫৩:১৪৭)। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে *রামচরিত* কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। অলঙ্কার প্রাচুর্যে, শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সন্ধ্যাকরনন্দীর *রামচরিত* কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্য আসরে উচ্চ আসনে বসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বরেন্দ্র অঞ্চলের এই সাহিত্য চর্চার ধারা পরবর্তী সেন শাসকগণের শাসনকালেও

অব্যাহত ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা পাই *সুভাষিতরত্নকোষ* ও *সদুক্তিকর্ণামৃত* নামক দুটি কাব্য সংকলন। এই কাব্যদুটি সেন শাসনকালে বরেন্দ্র অঞ্চলেই সংকলিত হয়েছিল।

উপসংহার

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র অন্যতম। পাল রাজাদের পিতৃভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই তাঁদের শাসন প্রায় চারশত বছর বাংলায় অব্যাহত ছিল। তাঁদের শাসনকালে এ অঞ্চলে একটি সুগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলার ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনাচরণে পাল শাসন এনেছিল স্বাতন্ত্র। পাল রাজাদের এই দীর্ঘ শাসনের নানা গৌরব ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে বরেন্দ্র অঞ্চল। এ অঞ্চলের বিহার, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, চিত্রকলা, সাহিত্য ও নগরসমূহ পাল শাসনের কীর্তির অংশ যা প্রাচীনকালের সমগ্র বাংলার প্রতিচ্ছবি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সমস্ত পুরাকীর্তি উন্মোচিত হয়েছে সেগুলো বাংলার প্রাচীনযুগের ইতিহাস পুর্নগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব পুরাকীর্তি বাংলাদেশ তথা বিশ্ব ঐতিহ্যেরও অংশ।

তথ্যনির্দেশিকা ও টীকা

চৌধুরী, আব্দুল মমিন (২০০২), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বর্ণায়ন।

চৌধুরী, সাইফুদ্দীন, ফজল, মুহাম্মদ আবুল, রহমান, শাহ আনিসুর ও ইসলাম, তাসিকুল (সম্পা.) (১৯৯৮), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী: বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়।

দাশগুপ্ত, প্রেমময় (২০১৬), *হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত*, ঢাকা: অরিত্র প্রকাশনী।

বসাক, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.) (১৯৫৩), *গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত রামচরিত*, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড।

ভুঁইয়া, মোকাম্মেল হোসেন (২০০৩), *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।

মজুমদার, অতীন্দ্র (২০১৬), *চর্যাপদ*, ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স।

মিশ্র, চিত্তরঞ্জন (২০০৮), "রামচরিত কাব্যে বর্ণিত বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা*, সংখ্যা-২, রাজশাহী: হেরিটেজ আর্কাইভস অব বাংলাদেশ হিস্ট্রি ট্রাস্ট।

মিশ্র, চিত্তরঞ্জন (২০১০), "রামচরিত কাব্যে বর্ণিত রামাবতীর ইতিহাস ও ঐশ্বর্য", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*। অষ্টাবিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৫৬), *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রহমান, সুফি মোস্তাফিজুর (সম্পা.) (২০০৭), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

শাস্ত্রী, অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৯২), *পাল অভিলেখ সংগ্রহ*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

হাই, মুহাম্মদ আব্দুল ও পাশা, আনোয়ার (সম্পা.) (২০১৪), *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার।

হোসেন, শাহানারা (২০১২), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ।

Haque, Enamul (1992), *Bengal Sculptures: Hindu Iconography up to c. 1250 AD*, Dhaka: Bangladesh National Museum.

Haque, Seema and Haque, M.M (2019), "New Understanding of Buddhist Cruciform Temples in Early Medieval Bengal", *Pratnatattva* silver jubilee volume, 25, Dhaka: Journal of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University.

Haque Zulekha (ed.) (2014), *Terracottas of Bengal: An Analytical Study*, Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art.

Majumdar, Nani Gopal (1929), *Inscriptions of Bengal*, Vol-III, Rajshahi: Verendra Research Society.

Majumdar, R.C (ed.) (2006), *History of Bengal*, Vol-1, Forth Impression, Dacca: The Univesity of Dacca.

Majumdar, R.C, Basak, R.G. and Banerji, N.G. (ed.) (1939), *Ramacharitam of Sandhyakara Nandin*, Rajshahi: Varendra Research Society.

Paul, Pramode Lal (1940), *The Early History of Bengal*, Vol-II, Calcutta: The Indian Research Institute.

Saraswati, S.K. (1962), *Early Sculpture of Bengal*, Calcutta: Sambodhi Publications Private Limited.

[Abstract: The Varendra is an important Janapada of ancient Bengal. Actually a significant part of Pundravardhana is known as Verendra. Because it was the homeland of Pala rulers. The Pala dynasty started their rule in Varendra and continued upto 400 years. All the glories and achievements of the dynasty are mainly found in this region. Well organized administration, public welfare policy, secular religious faith and co-existence, development of art and literature and the Pala school of Sculptural art are the main features of the glories of the Pala rulers. Indeed the glories of the Palas in Varendra should be addressed saparately because it forms an important chapter of the history of ancient Bengal. In this paper an attempt has been made to highlight the glories of the Palas in the region of Varendra, their land of origin.]